بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ এপ্রিল, ২০২৫ মোতাবেক ১১ শাহাদাত, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

খায়বারের যুদ্ধের পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। এর মধ্যে একটি হলো **তায়মাবাসীদের শান্তিচুক্তির ঘটনা**। তায়মা ছিল মদীনা থেকে সিরিয়ার পথে একটি প্রসিদ্ধ শহর যা মদীনা থেকে প্রায় চারশ' কি.মি. দূরে অবস্থিত। তায়মার ইহুদীরা খায়বার, ফাদাক ও ওয়াদিউল কুরা'র (পরাজয়ের) সংবাদ অবগত হলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় প্রতিনিধি প্রেরণ করে সন্ধির প্রস্তাব দেয়, যা মহানবী (সা.) গ্রহণ করেন এবং তায়মার ইহুদীদেরকে নিজেদের সহায়-সম্পত্তিসহ নিজ এলাকায় বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন।

এ সময় **ফজরের নামায দেরিতে পড়ার ঘটনাও** বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) খায়বারের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সারা রাত সফর অব্যাহত রাখেন, যখন তাঁর ঘুম পায় তখন মদীনার নিকটবর্তী (স্থানে) বিশ্রামের জন্য শিবির স্থাপন করেন এবং বেলাল (রা.)-কে বলেন, আজকের রাতে (তুমি) আমাদের নামাযের সময়ের সুরক্ষা করো (অর্থাৎ, খেয়াল রাখবে এবং নামাযের সময় জাগিয়ে দেবে।) এরপর হযরত বেলাল (রা.) তার জন্য যতটা সম্ভব ছিল নামায পড়েন (অর্থাৎ, জেগে থাকার জন্য সারা রাত নফল পড়তে থাকেন) এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা ঘুমিয়ে পড়েন। ফজরের সময় ঘনিয়ে এলে বেলাল (রা.) সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে নিজের বাহনের সাথে হেলান দিয়ে বসেন, উটনীর সাথে হেলান দিয়ে বেলাল (রা.)ও ঘুমিয়ে পড়েন। যার ফলে সূর্যের আলো বা রোদ তাদের গায়ে না পড়ার আগ পর্যন্ত মহানবী (সা.)ও সজাগ হন নি, বেলাল (রা.)ও নয় আর অন্য কোনো সাহাবীও জাগ্রত হন নি। মহানবী (সা.) সর্বাগ্রে সজাগ হন। তিনি (সা.) চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং বলেন, হে বেলাল! বেলাল (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত। আমার রূহকে সেই সত্তা (জাগ্রত হওয়া থেকে) আটকে রেখেছেন যিনি আপনাকে আটকে রেখেছিলেন। তিনি (সা.) সেখান থেকে যাত্রার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর তারা নিজেদের বাহনকে কিছুদূর সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। এরপর মহানবী (সা.) কিছুদূর গিয়ে অবস্থান করেন এবং সেখানে ওযূ করেন এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে বেলাল (রা.) নামাযের একামত দেন। অতঃপর তিনি (সা.) তাদের ফজরের নামায পড়ান। তিনি যেখানে ঘুমিয়েছিলেন সেখানে পড়ান নি, বরং সামনে অগ্রসর হয়ে কোনোস্থানে গিয়ে বাজামা'ত নামায পড়ান। নামায শেষে তিনি (সা.) বলেন, **'যদি কোনো ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায় তাহলে তার উচিত যখনই স্মরণ হবে সে যেন তা পড়ে নেয়, কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার স্মরণে নামায প্রতিষ্ঠা করো।'**

এটিও এখানে স্পষ্ট করা প্রয়োজন, **ফজর নামায দেরিতে (পড়ার) ঘটনা** বিভিন্ন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে। অনেকে এটিকে তাবূকের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন,

আবার অনেকে হুদায়বিয়ার সময়কার ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হতে পারে বর্ণনাকারী ভুলে গিয়েছিলেন এবং অন্য কোনো যুদ্ধের ঘটনা এর সাথে উল্লেখ করেছেন অথবা সম্ভবত একাধিকবার এ ঘটনা ঘটে থাকবে। যাহোক, আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

মদীনায় ফেরত আসার সময় সাহাবীরা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করছিলেন। এ সম্পর্কে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, মদীনায় ফিরে আসার সময় লোকেরা একটি উপত্যকায় আরোহণ করেন এবং তাকবীর ধ্বনিতে নিজেদের কণ্ঠস্বর উচ্চকিত করেন। **'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** বলেন। তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, **'তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখো! তোমরা কোনো বধিরকে ডাকছো না, আর না কোনো অনুপস্থিত (সত্তাকে)। আল্লাহ্ তা'লা শ্রবণকারী এবং উপস্থিতও আছেন, তাই কণ্ঠস্বর মধ্যম রাখো। তোমরা তাঁকেই ডাকছ, যিনি অত্যন্ত শ্রবণকারী এবং খুবই নিকটবর্তী, আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।'** বর্ণনাকারী বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর বাহনের পেছনে ছিলাম। তিনি আমার কথা শুনতে পান, যখন আমি لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ পড়ছিলাম। (মহানবীর একথা শুনে আমি لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ পাঠ করি)। মহানবী (সা.) তখন আমার আওয়াজ শুনে আমাকে ডাকেন, হে আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস! আমি নিবেদন করি, আমি উপস্থিত আছি। [আবু মূসা আশআরীর নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি হাজির আছি।] তিনি (সা.) বলেন, 'আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য সম্পর্কে অবহিত করবো না– যা জান্নাতের ধনভাণ্ডারগুলির একটি? আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.) কেন নয়? আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত, অবশ্যই আমাকে বলুন। তিনি (সা.) বলেন, لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ। তিনি (সা.) বললেন, এই বাক্যটি হলো, 'মানুষের মধ্যে না মন্দ থেকে বাঁচার শক্তি আছে এবং মানুষের মধ্যে ভালো কাজ করারও সামর্থ্যও নেই, শুধুমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত তৌফিকেই এটি সম্ভব।' এদিকে তিনি (সা.) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, **'তুমি যে বাক্যটি পড়ছিলে, তা অত্যন্ত উন্নতমানের বাক্য এবং এটি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন করে।'**

যাহোক, মদীনা অভিমুখে যাত্রা অব্যাহত ছিল। ইসলামী বাহিনী, যা মদীনা থেকে ৭ম হিজরীর মহররম মাসে যাত্রা করেছিল, আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজি ও সাফল্যে পরিপূর্ণ হয়ে সফর (মাসের) শেষ দিনগুলোতে বা রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে।

খায়বারে মহানবী (সা.)-এর অবস্থানের সময়কাল নিয়ে মতভেদ পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) খায়বারে ছয় মাস অবস্থান করেছিলেন। এই সময়ে তিনি দুবেলার নামায একত্র করে পড়াতেন। আবার কোনো কোনে রেওয়ায়েত অনুসারে, তিনি (সা.) সেখানে চল্লিশ দিন ছিলেন। বেশিরভাগ রেওয়ায়েতে স্বল্প সময় অবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

খায়বারের বিজয় মুসলমানদের অনুকূলে অনেক সুফল প্রকাশ পায়। খায়বার বিজয়ের একটি মৌলিক প্রভাব হলো, আরবের আশেপাশের অনেক গোত্র, যারা আগে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আর কিছু গোত্র তো সন্ধির প্রস্তাব দেয়, কিছু আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়াকেই নিরাপদ জ্ঞান করে, আর এভাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। খায়বার বিজয়ের আরেকটি ফলাফল ছিল, আরব উপদ্বীপে ইহুদীদের শক্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মদীনার ইহুদী এবং খায়বারের ইহুদীরা আরব অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো আর

বিশেষভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও বিদ্বেষে এতটাই লিপ্ত ছিল যে, কমবেশি প্রায় প্রতিটি বড়ো আক্রমণে শত্রুরা তাদের সমর্থন লাভ করতো। তৃতীয় মৌলিক প্রভাব ছিল, মদীনার মুসলমানদের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীরা বর্ণনা করেন, **খায়বার বিজয়ের পরেই আমরা পেট পুরে খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি**। (এর আগে তো আমরা পেট ভরে খাবারও খেতে পারতাম না।) খায়বার বিজয়ের পর মুসলমানদের কাছে পানাহার সামগ্রী এতটাই জমা হয়েছিল যে, তারা তাদের আনসার ভাইদেরকে সেই সমস্ত সম্পত্তি ও অংশ ফেরত দিয়ে দেন, যা তারা তাদের মুহাজির ভাইদেরকে তখন দিয়েছিলেন যখন তারা দারিদ্র্য ও কষ্টের সাথে মক্কা থেকে হিজরত করে এখানে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.)-র একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বর্ণনা রয়েছে, যাতে এসব বিশদ বিবরণও পাওয়া যায়। তিনি (রা.) বলেন যে, যখন মুহাজিরগণ মক্কা থেকে মদীনায় এসেছিলেন, তখন তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁদের কাছে কিছুই ছিল না, আর মদীনার আনসারদের কাছে জমি ও পশুসম্পদ ছিল। অতএব আনসাররা এভাবে বণ্টন করেন যে, তারা প্রতি বছর তাদের ফসলের অর্ধেক এই মুহাজিরদের প্রদান করতেন। হযরত আনাসের মা তাঁর ফলদায়ী খেজুর গাছ আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সেবায় উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) সেই গাছটি উম্মে আইমানকে দিয়ে দেন। অর্থাৎ নিজে রাখেন নি, উম্মে আইমানকে দিয়ে দেন। পরবর্তীতে যখন খায়বার থেকে ফেরার পর মুহাজিররা আনসারদেরকে তাদের সম্পত্তি ফেরত দিয়ে দেয়, তখন মহানবী (সা.) হযরত আনাসের মাকে খেজুর গাছটি ফেরত দিয়ে দেন।

হযরত আনাস বলেন, যখন আমি উম্মে আইমানকে বললাম যে, এই গাছটি এখন আমাদের ফেরত দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি বলেন, আমি এটি কখনোই ফেরত দেবো না। এটি রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে দিয়েছেন। সম্ভবত তিনি তাঁর (সা.) প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁর দেওয়া জিনিস ফেরত দিতে চাইছিলেন না। যাহোক, কারণ যা-ই থাকুক না কেন, তিনি বলেন, আমি এখন এটি ফেরত দেবো না। হযরত আনাস রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উম্মে আইমানকে বলেন, হে উম্মে আইমান! তুমি এই গাছটি দিয়ে দাও, এর বদলে আমি তোমাকে এত এত গাছ দেবো। কিন্তু তিনি রাজি হচ্ছিলেন না। তিনি বলেন, এটি প্রথমে আপনি (আমাকে) দিয়েছেন, এটি বরকতময়, আমি এটি দেবো না। এমনকি তিনি (সা.) যখন তাকে দশগুণ গাছ দেবার কথা বলেন, তখন তিনি সেই গাছটি ফেরত দেন।

ইতিহাসে একটি যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় যাকে **যাতুর রিকা-র যুদ্ধ** বলা হয়। এই যুদ্ধকে মুহারিব এর যুদ্ধ, 'বনু সা'লাবা-র যুদ্ধ' এবং 'বনু আনমার এর যুদ্ধ'ও বলা হয়, কারণ এই গোত্রগুলির পক্ষ থেকে এই যুদ্ধ হয়েছিল। যাতুর রিকা-র যুদ্ধের নাম 'গাজওয়া যাতুল আজীব'ও রাখা হয়েছে, কারণ এই যুদ্ধে অনেক অদ্ভুত ঘটনা বা মু'জিযা ঘটেছিল। এই যুদ্ধের নাম 'যাতুর রিকা' রাখার একটি কারণ এটি বর্ণনা করা হয় যে, এই এলাকায় একটি গাছ বা পাহাড় ছিল যার নাম ছিল যাতুর রিকা, তাই এই যুদ্ধের নাম 'যাতুর রিকা'-এর যুদ্ধ হয়ে যায়।

নামকরণের আরেকটি কারণ হযরত আবু মূসা আশআরি বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবীদের কাছে বাহন খুব কম ছিল। তিনি নিজেও ছয়জনের মধ্যে একজন ছিলেন যাদের মাত্র একটি বাহন ছিল, যাতে তারা পালাক্রমে আরোহণ করতেন। পাথুরে জমিতে হাঁটার কারণে সাহাবীদের পা আহত হয়েছিল এবং তারা ছেঁড়া পুরানো কাপড় পায়ে জড়িয়ে

হাঁটতেন। স্বয়ং হযরত আবু মূসা আশআরি-র শুধু পা-ই আহত হয় নি, বরং তাঁর নখও আহত হয়ে উঠে গিয়েছিল। কাপড়ের পট্টি প্যাঁচানোকে যেহেতু 'রিকা' বলা হয়, তাই এই যুদ্ধের নাম যাতুর রিকা-র যুদ্ধ অর্থাৎ প্যাঁচানো পট্টি-র যুদ্ধ হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছে। যাহোক, এগুলো হলো এর বিভিন্ন নাম।

আরেক জায়গায় এটি লেখা আছে যে, যে ভূমিতে এই যুদ্ধ হয়েছিল, সেই ভূমির বিভিন্ন রং ছিল। কেউ কেউ লিখেছেন যে, এই যুদ্ধে বিভিন্ন রঙের ঘোড়া ছিল। কেউ কেউ লিখেছেন যে, এই যুদ্ধে পতাকাগুলোতে পট্টি বানানো হয়েছিল বা বিভিন্ন পট্টি জুড়ে পতাকা তৈরি করা হয়েছিল। এই কারণে এটিকে যাতুর রিকা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ের একত্রীকরণের কারণে একে যাতুর রিকা বলা হয়েছে। এই যুদ্ধের আরেকটি নাম সালাতুল খওফ-এর যুদ্ধও বটে। কারণ এই যুদ্ধে খওফের নামাজ তথা ভয়ভীতির সময়ের নামাজ আদায় করা হয়েছিল।

এই যুদ্ধের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ অনুসারে যাতুর রিকার যুদ্ধ চার বা পাঁচ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল। অতএব ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের বরাতে যাতুর রিকা-র যুদ্ধকে বনু নাজিরের যুদ্ধের তিন মাস পরে চার হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে সাদ-এর মতে, এটি পাঁচ হিজরিতে হয়েছিল, যখনকিনা ইমাম বুখারি একটি শক্তিশালী সাক্ষ্য দ্বারা এই যুদ্ধকে খায়বার বিজয়ের পরে সাত হিজরিতে সংঘটিত বলে উল্লেখ করেছেন। সেই সাক্ষ্য হলো, হযরত আবু মূসা আশআরি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু হযরত আবু মূসা আশআরি খায়বার বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাই সাত হিজরির তারিখ এই যুদ্ধের জন্য বেশি যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবিয়ীন গ্রন্থের শেষে তাঁর বইয়ের অবশিষ্ট অংশের জন্য যে শিরোনাম উল্লেখ করেছেন, তাতে যাতুর রিকার যুদ্ধকে খায়বারের যুদ্ধের পরে, সাত হিজরির যুদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এই যুদ্ধের একটি কারণ ছিল এই যে, নজদ অঞ্চলে কিছু লোক মাঝে মাঝে চুরি ও ডাকাতি করে পথিকদের হয়রানি করত। এই লোকেরা কোনো একটি স্থানে স্থির ছিল না, তাই তাদের দমন করা বেশ কঠিন কাজ ছিল। মহানবী (সা.) তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ এটি বর্ণনা করা হয় যে, একজন লোক বাণিজ্য সামগ্রী নিয়ে মদীনায় এসেছিল। মদীনার লোকেরা তার কাছ থেকে সামগ্রী ক্রয় করে। তখন সে মুসলমানদের বলে যে, বনু আনমার ও বনু সা'লাবা তোমাদের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী সংগঠিত করেছে, কিন্তু তোমরা এ বিষয়ে উদাসীন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন এই খবর পান, তখন মদীনায় একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করে সফরের প্রস্তুতি নেন। ইবনে ইসহাক বলেন যে, তখন হযরত আবু যর গিফারিকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছিল। ইবনে সাদ ও ইবনে হিশাম বলেন যে, হযরত উসমান ইবনে আফফানকে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়েছিল। যাহোক, তিনি (সা.) এই সফরে বের হন।

যুদ্ধের অবস্থা ও ঘটনাবলি সম্পর্কে আরও বর্ণনা পাওয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা থেকে চারশ লোকের সঙ্গে বা কিছু বর্ণনা অনুযায়ী সাতশ বা আটশ লোকের সঙ্গে রওয়ানা হন এবং শুকরা উপত্যকায় পৌঁছেন। শুকরা উপত্যকা মদীনা থেকে দুই দিনের দূরত্বে অবস্থিত। সেখানে এক দিন অবস্থান করে চতুর্দিকে দল পাঠানো হয়। রাত পর্যন্ত সমস্ত দল ফিরে এসে জানায় যে, তারা কাউকে দেখেনি এবং তারা তাদের পায়ের চিহ্নগুলো মুছে দিয়েছে। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের সঙ্গে বের হন এবং নখল পর্যন্ত পৌঁছেন।

নখল মদীনা থেকে প্রায় বাষট্টি মাইল দূরে অবস্থিত। যখন তারা সেই গোত্রগুলোর আবাসস্থলে পৌঁছেন, তখন সেখানে নারীদের ছাড়া কাউকে পাওয়া যায় নি। নারীদের বন্দি করা হয়। কিছু ঐতিহাসিক নারীদের বন্দি করার উল্লেখ করেন নি। তারা বলেছেন যে, কোনো বন্দি করা হয় নি এবং যারা বেদুইন ছিল তারা পাহাড়ের চূড়ায় পালিয়ে গিয়েছিল। তারা পাহাড়ের চূড়া থেকে সমস্ত দৃশ্য দেখছিল। অর্থাৎ পুরুষরা পালিয়ে যায়, নারীরা সেখানে থেকে যায়। কারো মতে তাদের বন্দি করা হয়েছিল, কারো মতে হয় নি। বেশির ভাগ সম্ভাবনা এটাই যে, নারীদের বন্দি করা হয় নি।

হযরত জাবের বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) নখল থেকে যাতুর রিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি গাতফান সৈন্যদের সম্মুখীন হন, কিন্তু কোনো যুদ্ধ হয় নি। অবশ্য মুখোমুখি থাকার সময় একে অপরের আক্রমণের ভয় ছিল এবং এই আশঙ্কা ছিল যে, শত্রুরা যে কোনো মুহূর্তে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে। এই সময়ে, যেহেতু শত্রুপক্ষের আক্রমণের ভয় ছিল, তাই নামাজের সময় হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাতুল খওফ অর্থাৎ ভয়ভীতির সময়ের নামাজ আদায় করালেন। অর্থাৎ এমন নামাজ যেখানে কিছু লোক অংশগ্রহণ করে, অর্ধেক লোক প্রথম রাকাতে অংশগ্রহণ করে, অর্ধেক লোক নামাজের পরের অর্ধেকে এসে অংশগ্রহণ করে, তারপর পিছনে সরে যায় এবং এরপর দ্বিতীয় দল এসে অংশগ্রহণ করে এবং তাঁর (সা.) সাথে নামাজ আদায় করে। এর উল্লেখ কুরআন করিমে সূরা নিসায় পাওয়া যায় যে, এই ধরনের পরিস্থিতি হলে ভয়ের অবস্থায় কীভাবে নামাজ পড়তে হয় যাতে শত্রু আক্রমণ না করে। বায়হাকী হযরত জাবের (রা.) থেকে রেওয়াত করেছে, রসূলুল্লাহ (সা.) যোহরের নামায পড়িয়েছিলেন। মুশরিকরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার সংকল্প করে এবং বলতে থাকে, এখন তাদের ছেড়ে দাও এরপর আরেকটি নামায রয়েছে যা তাদের নিজেদের পুত্রের চেয়েও বেশি প্রিয়। জিবরাইল রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আসলেন এবং শত্রুদের দুরভিসন্ধির সংবাদ দিলেন। একটি নামায ছেড়ে দিয়েছিল তারা পরবর্তী নামাযে আক্রমণ করবে বলে। যাহোক এটি একটি রেওয়াত। সুবুলুল হুদা'তে রয়েছে শত্রুদের দুরভিসন্ধির সংবাদ জিবরাইল (আ.) রসূলুল্লাহ (সা.) কে দিলেন, তিনি আসরের সময় সালাতে খওফ পড়িয়েছিলেন। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, এটি প্রথম সালাতে খওফ ছিল যা তিনি (সা.) পড়িয়েছিলেন। বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী লিখেছেন, ভীতির সময়ের নামাযের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, কোন্ বছর প্রথমবার এই বিষয়ে আদেশ নাযেল হয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের অভিমত হলো প্রথমবার যাতুর রিকা' এর যুদ্ধে এই নামাযটি আদায় করা হয়েছিল। তবুও কোন্ বছর এই আদেশ নাযেল হয়েছিল সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ চার হিজরী, কেউ পাঁচ হিজরী, কেউ ছয় হিজরী, কেউ সাত হিজরী বর্ণনা করেছেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী সালাতুল খওফ বা ভীতির সময়ের নামায গাযওয়া বদরুল মওউদ এর পূর্বে প্রথমবার আদায় করা হয়েছিল, যেটি চার হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

এই সময়ে এক ব্যক্তির সাহাবীদের ওপর আক্রমণ করার ঘটনার উল্লেখও পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) এক রাতে একস্থানে শিবির স্থাপন করেন। সে সময় তীব্র বাতাস বইছিল, তিনি সাহাবীদের বললেন, কে আছে যে আজ রাতে আমাদের জন্য পাহারা দিবে? এতে হযরত আব্বাদ বিন বিশর ও হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) দাঁড়ালেন ও বললেন, আমরা আপনার জন্য পাহারা দিবো। এরপর তারা উভয়ে গিরিপথের চূড়ায় বসে পড়লেন।

হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরকে (রা.) বললেন, রাতের প্রথম অংশে আমি পাহারা দিবো আর তাকে বললেন, তুমি শুয়ে পড়। আর শেষ রাতে তুমি পাহারা দিও যেন আমি শুতে পারি। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের তো শুয়ে পড়লেন আর হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করলেন। তিনি নামায পড়ছিলেন, বর্ণিত হয়েছে যে, রাতে শত্রুপক্ষের এক লোক তাকে দেখে ফেললো। গিরিপথে হযরত আব্বাদ বিন বিশরের (রা.) ছায়া দেখতে পেল, নামায পড়ছিলেন, নড়াচড়া হচ্ছিলো। এতে সে নিশ্চয় চিন্তা করলো মুসলমানদের কোন ব্যক্তি হবে যে পাহারা দিচ্ছে। সে এটাই চিন্তা করে থাকবে। সে নিজের শত্রু মনে করে তীর নিক্ষেপ করলো। হযরত আব্বাদ বিন বিশরের (রা.) শরীরে তীর বিদ্ধ হলো। হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) নামায পড়ছিলেন, এতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি তীর বের করে ফেলে দিলেন। নামায ছেড়ে দিলেন না বরং নামাযরত অবস্থায় তীর বের করে ছুঁড়ে ফেললেন। নামায অব্যাহত রাখলেন। সে পুনরায় দ্বিতীয় তীর ছুঁড়লো। সেটাও তাঁকে বিদ্ধ করলো। তিনি সেটিকেও বের করে ছুঁড়ে ফেললেন। এরপর যখন সে তৃতীয় তীর ছুঁড়ে মারলো তখন হযরত আব্বাদ বিন বিশরের (রা.) অনেক রক্ত প্রবাহিত হলো। তিনি নামায সম্পন্ন করলেন এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরকে (রা.) ডেকে তুললেন। যখন সেই ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখতে পেলো তখন পালিয়ে গেলো। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) যখন হযরত আব্বাদ বিন বিশরকে (রা.) আহত অবস্থায় দেখলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে পূর্বেই কেন জাগালে না? তিনি বললেন, আমি নামাযে সূরা কাহাফের তিলাওয়াত করছিলাম, আর আমার মন চাচ্ছিলো না যে আমি এর তিলাওয়াতকে বাধাগ্রস্থ করি।

তাদের মাঝে এটি এক অদ্ভূত সম্পর্ক ছিল আল্লাহ্ তা'লার সাথে; নিষ্ঠা ছিল, বিশ্বস্ততা ছিল, ইবাদতের আগ্রহ ছিল। ক্ষতের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করেন নি। কোন কোন রেওয়াতে এটিও রয়েছে যে, হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরের (রা.) গায়ে তীর লেগেছিল। যাহোক পনেরো দিনের এই অভিযানের পর রসূলুল্লাহ (সা.) মদীনার দিকে ফেরত রওনা হলেন। তিনি জোআল বিন সুরাকাকে (রা.) মদীনা অভিমুখে প্রেরণ করলেন যেন তিনি মদীনাবাসীদেরকে মুসলামানদের নিরাপদ থাকার সুসংবাদ দেন। হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন সিরার নামক স্থানে পৌঁছালেন যা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত তখন উট জবাই করার নির্দেশ দিলেন। আর দিনভর সেখানে অবস্থান করেন এবং অন্যান্য মুসলমানরাও তাঁর (সা.) সাথে ছিল। সন্ধ্যার সময় মহানবী (সা.) মদীনায় প্রবেশ করেন তখন আমরাও তাঁর (সা.) সাথে ছিলাম।

এই যুদ্ধে কিছু মোজেযা [তথা অলৌকিক নিদর্শন]ও প্রকাশ পেয়েছিল যেমনটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এটি মোজেযা অভিযান নামেও পরিচিত।

শত্রু কর্তৃক তরবারি দ্বারা মহানবী (সা.) এর ওপর আক্রমণের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি মহানবী (সা.) এর সাথে নজদ অভিমুখে এক যুদ্ধে যান। লোকেরা খুব কাঁটাযুক্ত এক উপত্যকায় দুপুরে পৌঁছায়। মহানবী (সা.) সেখানে শিবির স্থাপন করেন। তখন দুপুর হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা গাছের ছায়ার খোঁজে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। মহানবী (সা.) বাবলা গাছের নিচে বিশ্রাম করেন এবং নিজ তরবারি ঝুলিয়ে রাখেন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়ি। এরপর দেখলাম মহানবী (সা.) আমাদের ডাকছেন। আমরা তাঁর (সা.) কাছে গিয়ে দেখতে পাই যে একজন বেদুইন তাঁর (সা.) পাশে বসে আছে। মহানবী (সা.) বলেন, আমি

যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন এই ব্যক্তিটি আমার তরবারি নিয়ে নেয়। আমি সজাগ হয়ে দেখতে পাই সে আমার দিকে তরবারি তাক করে রেখেছে। সে আমাকে বলে, তোমাকে আমার হাত থেকে এখন কে বাঁচাবে? আমি বললাম, আল্লাহ। সে তখন তরবারি খাপবদ্ধ করে নেয়। এই সেই ব্যক্তি যে এখানে বসে আছে। মহানবী (সা.) সেই হামলাকারীকে কোনো ধরনের শাস্তি দেননি।

এই ব্যক্তির নাম গওরস বিন হারেস বর্ণিত হয়েছে। কেউ তার নাম গওরক উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ আবার গওয়ারিস উল্লেখ করেছেন। এই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বর্ণনায় এসেছে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল আবার কোথাও বলা হয়েছে সে ইসলাম গ্রহণ করে নি। তবে সে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, ভবিষ্যতে সে কখনও মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে না। মহানবী (সা.) এর ওপর তরবারি দ্বারা আক্রমণকারীর আরেকটি ঘটনা বর্ণনা পাওয়া যায়। যেখানে দোসুর নামক এক ব্যক্তির মহানবী (সা.) এর ওপর আক্রমণের উল্লেখ রয়েছে। কিছু আলেম এই দুই ঘটনাকে একই ঘটনা বলে মনে করেন, আবার কেউ মনে করেন এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঘটনা। দোসুরের হামলার ঘটনা হিজরী তৃতীয় সনের গাযওয়া যি আমর অথবা গাযওয়া বনু গাতফান থেকে ফেরার পথে ঘটেছিল। মুশরিকরা মহানবী (সা.) কে একস্থানে একা শুয়ে থাকতে দেখে তাদের সর্দার দোসুরের কাছে যায়। এই ব্যক্তি (দোসুর) তাদের সকলের মাঝে সবচেয়ে সাহসী ছিল। মুশরিকরা তাকে বলে এই মুহূর্তে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একাকী শুয়ে আছে, এখন তোমার কাজ হলো তার সাথে বোঝাপড়া করে নেওয়া। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে দোসুর নিজেই মহানবী (সা.) কে শায়িত অবস্থায় দেখে বলতে আরম্ভ করে, এখন যদি আমি মুহাম্মদকে (সা.) হত্যা না করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ধ্বংস করে দিবেন। যা হোক দোসুর এই কথা বলা মাত্রই তরবারি তাক করে একদম মহানবী (সা.) এর মাথার পাশে গিয়ে থামে। অতঃপর আচমকা মহানবী (সা.) কে সম্বোধন করে বলে, আজ অথবা এটি বলেছে যে, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? মহানবী (সা.) শান্তভাবে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে তোমার হাত থেকে বাঁচাবেন। এরপর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর তার তরবারি হাত থেকে পড়ে যায়। মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ তরবারি হাতে তুলে নিলেন আর বললেন, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? দোসুর বলে, লা! কেউ না। এখন কেউ আমাকে বাঁচাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসূল। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি ভবিষ্যতে কখনও আপনার বিরুদ্ধে লোকদের সমবেত করবো না। মহানবী (সা.) তার তরবারি তাকে ফেরত দিলেন। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, দোসুর তাঁকে (সা.) উদ্দেশ্য করে নিবেদন করে, আল্লাহর কসম! দয়া প্রদর্শনের ব্যাপারে আপনি আমার চেয়ে উত্তম। মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, আনা আহাক্কু বিযালিকা মিনকা। আমি অনুগ্রহ প্রদানের ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে বেশি অধিকার রাখি। আর দোসুর নিজ জাতির কাছে ফিরে আসে, কিন্তু তার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। সে নিজ জাতির মাঝে তবলীগ করছিল। দোসুর ঘটনা বর্ণনা করছে যে, আমার সাথে কী ঘটেছিল, আমি কীভাবে পড়ে গিয়েছিলাম? সে পড়ে যাবার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করে বলে, আমি সেখানে একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দেখলাম। সেখানে যখন আমি তরবারি শাণিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তখন দেখি, অনেক দীর্ঘকায় একজন ব্যক্তি সেখানে আসে, সে আমাকে ধাক্কা দেয় আর আমি পিঠের দিকে পড়ে যাই। সে সময় আমি বুঝে যাই, এটি কোনো মানুষ নয়, এ তো কোনো ফেরেশতা। আর আমি তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকার করি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ

সত্য নয় এবং মুহাম্মদ (সা.) হলেন আল্লাহ্‌র রসূল। সে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের বিরুদ্ধে কখনো কোনো ষড়যন্ত্র করব না। এরপর সে নিজ জাতিকে ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করে। একস্থানে এভাবেও ঘটনাটি লেখা আছে, সেখানে একটি পাখিরও ঘটনা ঘটে। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। সাহাবীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি পাখির বাচ্চাদের ধরে নিয়ে আসে আর মহানবী (সা.) তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এই পাখির বাচ্চার মা কিংবা বাবা অথবা তাদের মধ্য থেকে একজন, মা-বাবা দুইজনই ছিল অথবা তাদের মধ্য থেকে একজন সেই সাহাবীর সামনে গিয়ে পড়ে যায়, যিনি তার বাচ্চাদের ধরেছিলেন। পাখির বাচ্চাদের ধরেছিল বিধায় মা অথবা বাবা পাখিটি আসে এবং তাদের সামনে নিজেকে সমর্পিত করে। তিনি (রা.) বলেন, আমি লক্ষ করি, লোকেরা অবাক হচ্ছিল, অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হচ্ছিল যে, এটি কী হলো– পাখিটি নিজেই এসে বসে গেল! তখন মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা এই পাখিটি দেখে অবাক হচ্ছো যে, এটি কেন বাচ্চাদের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে! তোমরা তার বাচ্চাদের ধরেছ আর সে নিজে নিজেই তার বাচ্চাদের ছাড়ানোর জন্য নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের প্রতিপালক-প্রভু এই পাখির চেয়েও বেশি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। এটি যেভাবে নিজের বাচ্চাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এসেছে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি এর চেয়ে বেশি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

এই মুজিযাসমূহের মাঝে এক পাগল বাচ্চার আরোগ্য লাভের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে যাতুর-রিকা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একজন গ্রাম্য মহিলা নিজের ছেলেকে সাথে নিয়ে আসে এবং নিবেদন জানায়, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি আমার ছেলে এবং এর ওপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করেছে। অর্থাৎ পাগলামি পেয়ে বসে তাকে। পাগলাবস্থা সৃষ্টি হয়। তিনি (সা.) তার মুখ খোলেন এবং তাতে (তাঁর মুখের) লালা দেন আর বলেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! দূর হয়ে যা। তিনি (সা.) এই দোয়া করেন। আমি আল্লাহ্‌র রসূল। এই বাক্যাবলি তিন বার বলেন। তারপর বলেন, এই বাচ্চাকে নিয়ে যাও এবং এই কষ্ট আর কখনো হবে না।

তিনটি ডিমের মাঝে বরকত-সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। উট পাখির ডিম ছিল। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, যাতুর-রিকা যুদ্ধে উরওয়া বিন যায়েদ হারসি তিনটি ডিম নিয়ে আসেন, যা উট পাখির ডিম দেবার স্থানে পড়ে ছিল। তিনি (সা.) বলেন, হে জাবের! এগুলো নিয়ে নাও এবং এই ডিমগুলো রান্না করো। আমি সেগুলো রান্না করি আর একটি পাত্রে এগুলো নিয়ে আসি। তারপর আমি রুটির খোঁজ করি কিন্তু পাওয়া যায় নি। মহানবী (সা.) এবং সাহাবীরা রুটি ছাড়াই তা খেতে আরম্ভ করেন, এমনকি তাঁরা পরিতৃপ্ত হয়ে যান। পেট ভরে যায় আর পাত্রে ডিম সেভাবেই থেকে যায় যেভাবে প্রথমে ছিল। অতঃপর আরো অনেক সাহাবী সেখান থেকে খান এবং তারপর আমরা সামনে অগ্রসর হই।

এখানে একটি উটের ঘটনার উল্লেখও পাওয়া যায়, যেটি তার মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, আমরা যাতুর-রিকা যুদ্ধ থেকে ফেরত আসার পথে যখন হাররা নামক স্থানে পৌঁছাই তখন দ্রুতবেগে একটি উট ছুটে আসে এবং ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে শুরু করে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কি জানো এই উট কি বলছে? এই উট তার মালিকের বিরুদ্ধে আমার কাছে অভিযোগ করছে। এর মালিক বেশ কয়েক বছর ধরে একে কাজে লাগাচ্ছে আর এখন সে একে জবাই করতে চায়। হে জাবের! এর মালিকের কাছে যাও আর তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। হযরত জাবের বলেন, আমি

বললাম, আমি তো এর মালিককে চিনি না। তিনি (সা.) বলেন, এই উট তোমাকে তার মালিকের কাছে নিয়ে যাবে। এই উটকে ছেড়ে দাও, সে নিজেই তার মালিকের কাছে চলে যাবে। অতএব সেই উট তাকে নিয়ে চলে গেল আর অবশেষে মালিকের কাছে পৌঁছে দিল। তিনি (রা.) বলেন, আমি তাকে তাঁর (সা.) কাছে নিয়ে আসি এবং মহানবী (সা.) তার সাথে উটের বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেন। মহানবী (সা.) বলেন, এই উট আমার কাছে বিক্রি করে দাও। আর সে উটটি তাঁর (সা.) কাছে বিক্রি করে দিল। তিনি (সা.) সেটিকে জঙ্গলে স্বাধীনভাবে চরার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেন।

এ প্রেক্ষিতে হযরত জাবের (রা.)-এর উট হারিয়ে যাবার ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, এক অন্ধকার রাতে আমার উট হারিয়ে যায়। আমি মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার উট হারিয়ে গেছে। তিনি (সা.) বলেন, তোমার উট অমুক জায়গায়, সেখানে যাও এবং উট নিয়ে আসো। আমি সেদিকে গেলাম কিন্তু উট পেলাম না। আমি ফিরে আসলে তিনি (সা.) আবার একই কথা বললেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি আবার গেলাম কিন্তু এবারও আমি উট পেলাম না। তাই ফেরত আসলাম। তখন তিনি (সা.) স্নেহের স্বরে বললেন, আমার সাথে চলো। তিনি আমার সাথে গেলেন এবং আমরা উটের কাছে পৌঁছালাম আর তিনি (সা.) উট আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

তার অলস উটেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের সম্পর্কে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তখন আমার উট ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। মহানবী (সা.) আমার কাছে আসলেন আর বললেন, হে জাবের! আমি বললাম, জি! তিনি (সা.) বললেন, কী হয়েছে? আমি নিবেদন করলাম, আমার উট ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে আর আমি পিছিয়ে পড়েছি। তিনি (সা.) নিজ বাহন থেকে নামলেন এবং বললেন, তোমার কাছে কি পানি আছে? আমি বললাম, জি আছে। এরপর আমি পানির একটি পাত্র নিলাম। তিনি (সা.) এর মাঝে ফুঁ দিলেন এবং আর সেই উটের মাথা, কোমর ও পিঠে ছিটিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, আমাকে একটি লাঠি দাও। আমি তাকে আমার লাঠি দিলাম অথবা বললেন, আমি গাছ থেকে একটি কঞ্চি কেটে দিলাম। যাহোক, সেই উটকে তিনি (সা.) কয়েক ঘা দিলেন এবং নিজ লাটি দ্বারা সেটিকে হাঁকাতে লাগলেন। এরপর বললেন, আরোহণ করো। আমি আরোহণ করলাম। সেই উটে চড়ে বসলাম। আমি লক্ষ করলাম, সেই উট এতটাই দ্রুততার সাথে ছুটতে শুরু করল যে, আমি তখন মহানবী (সা.)-এর চেয়ে এগিয়ে যেতে বাধা দিচ্ছিলাম। তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে চলছিলাম আর তিনি (সা.) আমার সাথে কথা বলছিলেন। আর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি জবাব দিলাম, জি হ্যাঁ। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী মেয়েকে নাকি বিধবাকে? আমি বললাম, বিধবা নারীকে। তিনি বললেন, যুবক হয়ে কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? তুমি নিজেও যুবক, তুমি তার সাথে খেলতে পারতে, সে-ও তোমার সাথে খেলাধুলা করতে পারত। আমি নিবেদন করলাম, আমার বেশ ক'জন বোন রয়েছে। হযরত জাবের (রা.)-এর পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তার ০৭ জন কন্যা সন্তান ছিল যারা জাবের (রা.)-এর বোন ছিল। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমার কয়েকজন বোন আছে আর আমি ভাবলাম, আমি এমন কোনো নারীকে বিয়ে করব যে তাদের মনস্তুষ্টি করবে, তাদের চুল আঁচড়িয়ে দিবে, ঝুঁটি করে দিবে আর তাদের লালন-পালন করবে। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, এখন তুমি বাড়ি পৌঁছাতে যাচ্ছ। (বাড়ি) যখন

পৌঁছাবে তখন বুদ্ধিমত্তার সাথে, সাবধানতার সাথে কাজ করবে। এই উপদেশ প্রদান করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি তোমার এই উট বিক্রয় করবে? আমি বললাম, জ্বি, হ্যাঁ। তখন তিনি (সা.) সেটি আমার কাছ থেকে এক আওকিয়া রূপার বিনিময়ে ক্রয় করেন। এরপর মহানবী (সা.) আমার পূর্বে মদীনাতে পৌঁছান আর আমি পরবর্তী দিন সকালে পৌঁছাই। আমি মসজিদে আসলে তাঁকে (সা.) মসজিদের দরজায় পাই। তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, এখনই পৌঁছলে? আমি বললাম, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, তোমার উট ছেড়ে দাও আর মসজিদে গিয়ে দু-রাকাত নামায পড়ো। অতএব, আমি ভিতরে প্রবেশ করি আর নামায পড়ি। এরপর তিনি (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেন, তাকে এক আওকিয়া রূপা মেপে দাও। (এটি) সেই উটের মূল্য যা পথের মাঝে নির্ধারিত হয়েছিল। হযরত বেলাল (রা.) (রূপা) মেপে আমাকে দিয়ে দেন এবং কিছু অতিরিক্তও দেন। এরপর আমি যখন ফিরে যাচ্ছিলাম তখন তিনি (সা.) বলেন, জাবেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো। জাবের (রা.) বলেন, আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এখন মহানবী (সা.) আমার উট ফিরিয়ে দেবেন আর আমার কাছে এটি ফিরিয়ে দেবার চেয়ে বড় আর কোনো অপছন্দনীয় বিষয় ছিল না। তিনি (সা.) বলেন, তোমার উটও নিয়ে নাও আর এর মূল্যও নিজের কাছে রাখো। অর্থাৎ হযরত জাবের (রা.)-এর ভাবনা তার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত ছিল যে, উট ফিরিয়ে দেবার ফলে হয়ত (উটের) মূল্যও ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, মূল্যও রাখো আর উটও রাখো। তিনি (সা.) উটের মূল্য ফিরিয়ে নেন নি।

অলৌকিক নিদর্শনাবলির মাঝে অল্প পানি বহুগুণে বৃদ্ধি পাবার একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, সেই যুদ্ধাভিযানের মাঝেই একবার মহানবী (সা.) বলেন, হে জাবের! ওযুর জন্য ঘোষণা দাও। আমি বললাম, শুনো! ওযু কর, ওযু, ওযু। আমি মানুষের মাঝে এই ঘোষণা করে দেই। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে এই নিবেদন করি, এখন আমাদের কাছে কাফেলার মাঝে এক বিন্দুও পানি পাই নাই। তিনি (সা.) বলেন, অমুক ইবনে অমুক আনসারীর কাছে যাও আর দেখো তার মশকে কিছু আছে কিনা। তিনি (রা.) বলেন, আমি সেই দিকে যাই আর সেগুলো দেখলাম তো তার মশকগুলোর মাঝে একটির মুখে (পানির) একটি বিন্দু ছিল অর্থাৎ খুবই সামান্য পানি ছিল। আমি যদি সেটি কাত করে ঢালতাম তবে এর শুষ্ক স্থান তা শুষে নিত। এতটুকু ছিল যে, সেটি থেকে তা বের করাই দুষ্কর ছিল। অতঃপর আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই মশকের মুখে আমি শুধুমাত্র এক বিন্দু পানি পেয়েছি, খুবই সামান্য (পানি)। আমি যদি এটি কাত করে ঢালি তবে এর শুষ্ক স্থান তা শুষে নিবে। তিনি (সা.) বলেন, সেটি আমার কাছে নিয়ে আসো। আমি সেটি তাঁর (সা.) কাছে আনলাম। তিনি (সা.) সেটি নিজের হাতে ধরলেন এবং কিছু বলা আরম্ভ করেন, দোয়া করেন। আমি জানি না কী বলেছেন। তিনি (সা.) সেটি নিজের হাতে চাপতে থাকেন। এরপর তিনি (সা.) আমাকে সেটি দিয়ে বলেন, হে জাবের! একটি বড় পাত্র নিয়ে আসো। আমি বড় পাত্র নিয়ে এসে তা তাঁর (সা.) সামনে রাখলাম। মহানবী (সা.) বড় পাত্রে এভাবে হাত ওঠান। পাত্রে এভাবে হাত ওঠান আর এভাবে প্রসারিত করেন। এবং নিজের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দেন, অর্থাৎ পাত্রে এভাবে হাত প্রসারিত করেন। এরপর নিজের হাত পাত্রের তলানিতে রেখে দেন। প্রথমে পুরো হাত প্রসারিত করেন এরপর নিজের হাত নিচে তলানি পর্যন্ত নিয়ে যান। এবং বলেন, হে জাবের! নাও, আমার হাতের ওপর ঢালো এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করো। পানির যতটুকু ফোঁটা আছে তা আমার হাতে ঢেলে যাও। আমি তা মহানবী

(সা.)-এর হাতে ঢালি এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করে আমি পানিকে দেখলাম যে, তাঁর (সা.) আঙ্গুলের মাঝে পানি ঝর্ণার ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছে, এমনকি সেটি পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তিনি (সা.) বলেন, হে জাবের! প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে ডাকো যার পানির প্রয়োজন আছে। তিনি (রা.) বলেন, লোকেরা এসে পানি পান করে, এমনকি তারা পরিতৃপ্ত হয়ে যায়।

তিনি বলেন যে, আমি জিজ্ঞাসা করি আর কারও পানির প্রয়োজন আছে কি? অতপর মহানবী (সা.) পাত্র থেকে নিজের হাত বের করেন আর সেটি পানিতে পরিপূর্ণ ছিল। মহানবী (সা.)-এর এরূপ অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেনঃ

এই পর্যায়ের লেকায় (তথা ঐশী সাক্ষাতে) মাঝে মাঝে মানুষের দ্বারা এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয় যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে আর এর মাঝে এক প্রকার ঐশী শক্তির রং দেখা যায়। যেমন আমাদের পিয় নেতা ও প্রিয়তম, নবীদের সর্দার হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) বদর যুদ্ধের সময় এক মুঠো কঙ্কর কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারেন এবং এটি কোনো দোয়ার মাধ্যমে ছিল না বরং তাঁর আত্মিক শক্তির মাধ্যমে ছিল। কিন্তু সেই মুঠোর মধ্যে একপ্রকার ঐশী শক্তি প্রকাশ পেল, যার প্রভাবে এমন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল যে, কাফিরদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যার চোখে এই কঙ্করের প্রভাব পড়ে নি। সবাই অন্ধের মত হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে এমন বিভ্রান্তি ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হল যে, তারা মাতালের মতো ছুটে পালাতে লাগল। এই অলৌকিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (সূরা আনফালঃ ১৮) অর্থাৎ 'তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি তা নিক্ষেপ করো নি বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন।' মোটকথা এর অভ্যন্তরে ঐশী শক্তিই কার্যকর ছিল, এটি কোন মানবীয় শক্তির কাজ ছিল না।

আর অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর আরেকটি অলৌকিক ঘটনা হলো চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া-ও সেই ঐশী শক্তির মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছিল, এর সঙ্গে কোনো দোয়া যুক্ত ছিল না বরং যা নবীজী (সা.) শুধুমাত্র নিজস্ব শক্তির মাধ্যমেই দেখিয়েছিলেন, যেখানে কোনো দোয়া ছিল না।

অনেক সময় অল্প পানি যা একটি মাত্র বাটিতে ছিল, তাতে তিনি নিজের আঙুল প্রবেশ করালে তা এত বেশি হয়ে যেত যে, একটি সম্পূর্ণ সৈন্যদল, উট এবং ঘোড়াগুলোও তা থেকে পানি পান করত, তবুও পানির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকত। অনেকবার কয়েকটি রুটির ওপর হাত রাখলে তা হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষকে তৃপ্ত করত। আবার কখনো অল্প দুধে নিজের ঠোঁটের বরকত দান করে একটি দলের ক্ষুধা মিটিয়ে দিতেন। কখনো লবনাক্ত কূপে নিজের মুখের লালা ফেলে তা মিষ্টি করে দিতেন। আবার কখনো কোনো মারাত্মক আহত ব্যক্তির গায়ে হাত রেখে তাকে সুস্থ করে তুলতেন। এমনকি কারো চোখের পুতলি যুদ্ধের আঘাতে ছিটকে পড়লে নিজের হাতের বরকতে তা আবার ঠিক করে দিয়েছেন। এভাবেই অনেক অলৌকিক কাজ তিনি নিজ শক্তি ও ঐশী সাহায্যে সম্পন্ন করেছেন, যেগুলোর পেছনে এক অদৃশ্য ঐশী শক্তি মিশ্রিত ছিল।

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، إنك حميد مجيد

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)